সৈয়দ মুজতবা আলী এবং তার দেশে-বিদেশে

ফজলুল হক সৈকত

ভারতের শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী এবং জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে, ১৯২৭ সালে কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ফারসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষক পদে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন সৈয়দ মুজতবা আলী। অতঃপর তিনি জার্মানি, মিসর এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এ ছাড়া পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং ভারতের রেডিওতে মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় সৈয়দ মুজতবা সরস-মার্জিত-বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যধারার প্রবর্তক। ব্যঙ্গ ও রঙ্গ-রসিকতায় তার রচনা প্রদীপ্ত। ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস, সাহিত্য-সমালোচনা ও মননশীল প্রবন্ধ মিলিয়ে তার বিপুলসংখ্যক রচনায় পাণ্ডিত্য ও সৃজন-সামর্থ্যের বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। অন্তত ১০টি ভাষায় দক্ষতা অর্জনকারী এই বিরল প্রতিভা বাঙালি বিদ্বজ্জন ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন।

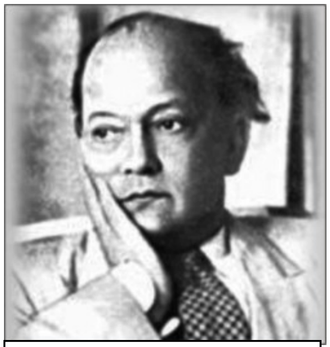

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ সৈঃ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে-বিদেশে (১৯৪৯), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২), চাচাকাহিনী (১৯৫৯), শবনম (১৯৬০), টুনিমেম (১৯৬৩) এবং কত না অশ্রুজল (১৯৭১) বহুল পঠিত ও নন্দিত গ্রন্থ। দেশে-বিদেশে উপন্যাস নাকি ভ্রমণকাহিনী- এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে যেভাবেই বিবেচনা করা হোক না কেন গ্রন্থটিকে ভ্রমণ-উপন্যাস বললে বোধ করি কারও তেমন কোন আপত্তি থাকবে না। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল বইটিতে লেখক ভূগোল ও প্রকৃতির বিবরণ, জীবন ও সংস্কৃতির বিশেষণ এবং মানবগতির বিচিত্র স্বভাবের যে অনুপুঙ্খ, হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দঘন উপস্থাপনা হাজির করেছেন, তাতে তার চিন্তা এবং পরিবেশনশৈলীর নৈপুণ্যে পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারে না। দেশে-বিদেশে হয়তো তার জীবন-অভিজ্ঞতার এক বিশ্বস্ত বিবরণ; সে অর্থে এটি জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যের কাতারে দাঁড়াতে পারে অনায়াসে। গ্রন্থটির ইংরেজি বা ফরাসি কিংবা চাইনিজ অথবা হিন্দি ভাষায় অনুবাদ হলে বিশ্বসাহিত্যের বিরাট উঠানে বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যস্রষ্টা সম্বন্ধে নতুন ধারণার জন্ম হবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

বইটির শুরুতে, একজন বাঙালি অফিসারের বহির্দেশ ভ্রমণের সূচনাপর্বকে তিনি বর্ণনা করছেন গল্পকথকের অনুভবের আলোয় : 'গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল, সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনিত- মনে হল, আমি একা।' মুজতবার পরিবেশ-অনুভব এবং ভাষাকাঠামো বেশ স্বাস্থ্যবান। পরিণত লেখকের কলম থেকেই বেরোতে পারে এ রকম অভিব্যক্তি। অনভিজ্ঞ এই ভ্রমণকারীর অবস্থা বোঝানোর জন্য তিনি যে তুলনা ও বর্ণনাচাতুর্যের সহায়তা নিয়েছেন, তা বড়ই উপভোগ্য। মুজতবা জানাচ্ছেন : 'আর বাড়িয়ে বলব না। এই তালতলাতেই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে, এমেটিন ইনজেকশন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যায়, ইংরিজীতে যাকে বলে মডলিন- তখন নাকি পাশের বাড়ির বিড়াল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিদেশে যাওয়া আর এমেটিন ইনজেকশন নেওয়া প্রায় একই জিনিস।'

মেহমানদারি করতে হলে টাকা থাকা না থাকা যে জরুরি কোন বিষয় নয়- ইচ্ছাটাই আসল ব্যাপার,

তা পাঠানদের একটা অতিপ্রিয়, দৃষ্টিগোচর, বৈশিষ্ট্য। পাঠানদের খানাপিনার প্রতি অতি-আসক্তি আর আতিথেয়তা বা আন্তরিকতার কথা জানাতে সৈয়দ মুজতবা কোন রকম কার্পণ্য করেননি। যাত্রাপথের একদিনের অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন : 'সেদিন গল্পের পাবনে রৌদ্র আর গ্রীষ্ম দুই-ই ডুবে গিয়েছিল। আর কী খানাপিনা! প্রতি স্টেশনে আড্ডার কেউ না কেউ কিছু না কিছু কিনবেই। চা, শরবৎ, বরফজল, কাবাব, রুটি, কোনো জিনিসই বাদ পড়ল না। কে দাম দেয়, কে খায়, কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। আমি দু'একবার আমার হিস্যা দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম। বারোজন তাগড়া পাঠানের তির্যকব্যূহ ভেদ করে দরজায় পৌঁছবার বহু পূর্বেই কেউ না কেউ পয়সা দিয়ে ফেলেছে।'

পাঠানদের মুজতবা আলী অত্যন্ত অলস, আড্ডাবাজ বললেও তারা যে আরামপ্রয়াসী নন এবং তাদের বিলাসিতাও যে সীমা ছাড়ায় না, সে কথা বলতে ভোলেননি। গালগল্প আর লম্বা আড্ডায় মশগুল থাকার স্বভাবের ভেতরে তাদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম আবিষ্কার করে লেখক বিস্মিত হয়েছেন। অনুর্বর ভূমির এসব বাসিন্দা ব্যবসা-বাণিজ্যে বড়ই অপরিপক্ব। অভাবের তাড়নায় লুটতরাজ মাঝেমধ্যে করে বটে; তবে আন্তরিকতায় অতুলনীয়। মুজতবা লিখছেন :

ক. তবে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। পাঠানের ভিতরে বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। অনুভূতির জগতে তারা একই মাটির আসনে বসে, আর চিন্তাধারায় যে পার্থক্য সে শুধু কেউ খবর রাখে বেশী, কেউ কম। কেউ সেক্সপীয়র পড়েছে, কেউ পড়েনি। ভালমন্দ বিচার করার সময় দুই দলে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, মনে হয়নি। আচার-ব্যবহারে এখনো তারা গুষ্টির ঐতিহ্যগত সনাতন জান-দেওয়া-নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে।

খ. ফসল ফলে না, মাটি খুঁড়লে সোনা চাঁদি কয়লা তেল কিছুই বেরোয় না, এক ফোঁটা জলের জন্য ভোর হবার তিন ঘণ্টা আগে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরোয়, এই দেশ কামড়ে ধরে পড়ে আছে মূর্খ পাঠান, কত যুগ ধরে, কত শতাব্দী ধরে কে জানে? সিন্ধুর ওপারে যখন বর্ষার বাতাস পর্যন্ত সবুজ হয়ে যায় তখন তার হাতছানি পাঠান দেখেনি? পুরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া অদ্ভুত মিঠে মিঠে গন্ধ নিয়ে আসে, আজ পর্যন্ত কত জাত তার নেশায় পাগল হয়ে পুব দেশে চলে গিয়েছে- যায়নি শুধু মূর্খ আফ্রিদী মোমন্দ।

ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জাতিগত সাংস্কৃতিক ব্যাপারাদির পরিচয় তুলে ধরতে মুজতবা আলী কোন কার্পণ্য করেননি। যেমন বিভিন্ন জাতির কারবারি কায়দা সম্বন্ধে তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা এ রকম : 'একটা জিনিসে পাঠানে বাঙালীতে মিল দেখতে পেয়েছি সেইটে আপনাকে বলছি, শুনুন- এখানে যে রকম কারবার পাঞ্জাবী আর শিখদের হাতে, কলকাতায়ও কারবার বেশীরভাগ অ-বাঙালির হাতে। আর বাঙালী যখন ব্যবসা করে তখন তার কায়দাও আজব।' মানুষের সরলতা বিষয়ে বলতে গিয়ে লেখক এক প্রবাদসম বাক্য তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন- যে ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতাকে ঢাকবার চেষ্টা করেন, তার চোখে অপরের মূর্খতা ধরা পড়ে না। গল্পনির্মাতা লিখছেন : 'চোখের সামনে ধরা আপন বন্ধমুষ্টি দূরের হিমালয়কে ঢেকে রাখে।'

একজন কাবুল অভিমুখী অভিযাত্রী বাঙালি পথে পথে কুড়িয়েছেন নানা অভিজ্ঞতা, বিচিত্র কথামালায় আটকে থাকা হাসির খোরাক আর শিক্ষণীয় সব ব্যাপার। আর তা সরল বর্ণনায় শেয়ার করেছেন তার পাঠকের সঙ্গে। জাতিগত-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে তিনি মাঝেমধ্যে বিভিন্ন দেশের প্রবাদও প্রয়োগ করেছেন। যেমন লিখছেন :

ক. ফার্সীতে প্রবাদ আছে, 'দের আয়দ্ দুরস্ত আয়দ্'। অর্থাৎ 'যা কিছু ধীরেসুস্থে আসে তাহাই

মঙ্গলদায়ক'।

খ. আরবীতেও আছে, 'অল অজলু মিনা শয়তান'। অর্থাৎ কি না 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা'।
গ. আরবী ভাষায় একটা প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উস্ সফর্, নিস্ফ্ উস্ সফর্'– অর্থাৎ কি না 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।' পুর্ব বাঙলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠোন সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।'

আফগান মুলুকের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে দেশের প্রকৃতির বিরূপতা এবং অধিবাসীদের দুর্ভাগ্যকে লেখক তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক বিবরণের আলোয়। তার বিবরণ থেকেই খানিকটা পাঠ নেয়া যাক :

'কাবুল নদী আমার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু ছিল। তার গান শুনতুম, আর নাচ দেখতুম। তার লুটিয়ে-পড়া সবুজ আঁচলের এক প্রান্তে আসন পেতে বসতুম। এখন আমাদের অন্য সম্পর্ক। আচ্ছা বলুন তো, অমাবস্যার অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আপনি কখনো নদীর পারে কান পেতে শুয়েছেন?'

গ্রন্থটিতে ভ্রমণের আনন্দ ও অজানাকে জানার সুধারসের পাশাপাশি গভীর পর্যবেক্ষণের অনুভবে পরিবেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাল-হকিকত। আফগান, হিন্দুস্থান, ইরান কিংবা চীন বিষয়ে ইংরেজদের মনোভাব ও রাজনৈতিক অভিপ্রায় কী, তারও নিবিড় পর্যবেক্ষণ ধরা পড়ে লেখকের বর্ণনায়। স্বাধীন আফগানিস্তানের মানুষের জীবনের চালচিত্রও প্রকাশ করতে তিনি কোন রকম কুণ্ঠাবোধ করেননি।

জীবন-অভিজ্ঞ সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে-বিদেশে বইটিতে কিছু প্রবাদসম বাক্য পাঠকের নজর কাড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরলস চর্চা আর জীবন ও মানুষকে নিবিড়ভাবে দেখার বাসনা থেকে লেখকের যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, তা থেকেই বোধ করি উৎসারিত হয়েছে এসব কথামালা বা প্রৌঢ়োক্তি। কতক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

ক. কোনো দেশের গরীব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্তত আপন গাঁয়ে মানে না।

খ. ইংরেজ এবং অন্য হরেক রকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না।

গ. পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়।

ঘ. বাঙালি আর কিছু পারুক না পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবুত।

কবিতা-লগ্নতা কিংবা বলা চলে লেখকের কবি-স্বভাব এই গ্রন্থটিতে স্পষ্ট। বর্ণনাভঙ্গিতে এবং মধ্যে মধ্যে নিজের লেখা ও সংগ্রহ করা কবিতা জাহির করার মাধ্যমে তার সে প্রবণতাটাই প্রকাশ পায় মাত্র।

প্রতিবেদকঃ ফজলুল হক সৈকত, ঢাকা, ১১/০৯/২০১১